দৈনিক জনকণ্ঠ ৫।

তারিখ AUG 7 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস এবং নিয়ন্ত্রণের রিমোট কন্ট্রোল

দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানীর অনতিদূরে অবস্থিত হলেও ঢাকা, রাজশাহী বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো 'নানান ঘটনার ঘনঘটায়' খুব কম সময়েই সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছে। কিন্তু ইদানিং রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে নিজের অস্তিত্ব দেশবাসীকে মনে করিয়ে দিচ্ছে এবং যেন বলতে চাচ্ছে, এ দেশের অসুস্থ সমাজ ও রাজনীতির বাস্তবতা থেকে সে বিচ্ছিন্ন নয়। এ সব কিছু গা সওয়া হলেও গেল বছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন মাত্রায় কলঙ্কের তিলক নিয়ে অধোমুখে দাঁড়াল দেশবাসীর সামনে। প্রকাশিত হলো বেশ কয়েকটি ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা। আর এসব ঘটনার নায়ক হিসাবে চিহ্নিত হয় তাদেরই সতীর্থরা। তবে এসব অঘটনঘটনপটিয়সীরা সাধারণ ছাত্র নয়। তারা রাজনৈতিক পরিচয়ের সূত্রে 'অসাধারণ'। যাদের নাম উচ্চারিত হয় হল দখল, সিট দখল, টেন্ডার, চাঁদাবাজির নায়ক হিসাবে। যারা 'সাত খুন করেও' নিরাপত্তার আশ্বাস পায় প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ মদদদাতাদের কাছ থেকে পরে জাতীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত মুরুব্বীদের কাছ থেকে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সন্ত্রাস ও অচলাবস্থা ওপরের ঘটনারই ধারাবাহিকতা। ইতোমধ্যে প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে দেশবাসী অবহিত হয়েছেন হল দখল-পুনর্দখলের নাটক আর ছাত্র বিক্ষোভের কথা। উদ্বেগ- উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন এই

প্রসঙ্গ ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

একেএম শাহনাওয়াজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। সচেতন বিবেক আরেকবার হোঁচট খেয়েছে। গত ৩ আগস্ট দৈনিক জনকণ্ঠ 'জাবি ক্যাম্পাস অশান্ত' বলে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। সম্পাদকীয়ের শেষদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সিন্ডিকেটের প্রতি দাবি জানানো হয়েছে চর দখলের মতো হল দখলের এই নাটক বন্ধ করার জন্য। একই সাথে কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন বহিষ্কৃত ছাত্র ও বহিরাগতদের ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আমার মনে হয়, জনকণ্ঠের সম্পাদকীয়র এই দাবি ও আহ্বান দেশবাসীরই আকুতি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ কাজটি করতে পারলে দেশবাসী মুক্তি পেত একটি রাহুগ্রাস থেকে। কিন্তু শত সদিচ্ছা থাকলেও এই মহতী কার্যক্রম গ্রহণ ও কার্যকর করা যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, সে জরুরী বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের একটি ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষায়তন বলেই সম্ভবত এখানকার ছাত্র রাজনীতির, বিশেষ করে ক্ষমতার রাজনীতির চরিত্র একটু ভিন্ন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে সরকারী ও বিরোধী শক্তিমান দলগুলোর অঙ্গসংগঠন হিসাবে বড় ছাত্র দলগুলো নিজেদের বলয় রক্ষা অথবা শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকে সেখানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ বরাবরই বজায় থাকে সরকারী দলের অঙ্গ সংগঠনটির ওপর। অর্থাৎ সরকার বদলের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির নিয়ন্ত্রণও রাতারাতি প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পাল্টে যায়। ফলে পূর্বতন দলের নেতা-কর্মীদের অনেকেই ভোল পাল্টে ফেলে তাদের জাতীয় রাজনীতির নেতৃত্বের মতো। যেহেতু শক্তির বিচারে একটি দলেরই নিয়ন্ত্রণ তাই স্বার্থের ভাগাভাগিতে দলীয় কোন্দল স্পষ্ট হতে থাকে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ রক্ষাকারী দলগুলো এখন সবচেয়ে বড় ব্যবসাদার। এদিক থেকে তারা মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুর মতোই। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছাড়াও প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর যাবতীয় নির্মাণ কাজের শুরুতে ভূমিদাসদের মতো ঠিকাদারদেরও নজরানা নিয়ে আসতে হয় তাদের দরবারে। শোনা যায়, এসব আয়ের অংশ 'নিয়মমাফিক' চলে যায় কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে। শোনা কথার অল্প কিছু বস্তুনিষ্ঠ হলেও বোঝা যায় রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক ধরনের বৈধতা তৈরি হয়ে গেছে। এই বাস্তবতা সামনে রেখেই জাহাঙ্গীরনগর - বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী সরকারপন্থী ছাত্র সংগঠনে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চাঙ্গা হয়েছে। চাঁদার ভাগাভাগিতে প্রাধান্য অর্জনের জন্য কোন সরকারের আমলে হয়েছে দলের স্থানীয় অস্থানীয় গ্রুপ কখনও হয়েছে ক-খ গ্রুপ বনাম গ-ঘ গ্রুপ (রূপক অর্থে)।

> **জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্চপর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকেই রাজনৈতি[illegible] গোষ্ঠীস্বার্থ চিন্তার উর্ধে উঠে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণের রিমোট কন্ট্রোল ক্যাম্পাসের বাইরে রেখে সম্ভব নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি বজায় রাখা।**

জাহাঙ্গীরনগর বর্তমান হল দখলের নাটকে ছাত্রলীগের (পত্রিকার ভাষায়) 'ধর্ষক গ্রুপ' বনাম 'কিলার গ্রুপের' হল দখল-পুনর্দখলের নাটকে অংশগ্রহণ, বহিরাগত সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের আমন্ত্রণ-- উল্লিখিত স্বার্থ চিন্তা থেকেই পূর্ণতা পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নাজুক পরিস্থিতিতে ছাত্রঐক্যের ব্যানারে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ একটি ভিন্নমাত্রা যুক্ত করেছে। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্মিলিত ছাত্রঐক্যের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ নতুন কিছু নয়। গত বছর ধর্ষণকারীদের বিচারের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল ছাত্রঐক্য। এবার 'ধর্ষক গ্রুপের' হল দখলের পরও ছাত্রঐক্যের ব্যানারে ছাত্র বিক্ষোভ তীব্রতা পেয়েছে। এই বিক্ষোভ সংগঠনে প্রধানত নেতৃত্ব দিচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। ছাত্রঐক্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলেও এদের আন্দোলন পদ্ধতিও প্রশ্নের উর্ধে থাকেনি। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলন ধর্ষক গ্রুপ বলে চিহ্নিত বহিষ্কৃত ও বহিরাগতদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও 'কিলার গ্রুপ' বলে চিহ্নিত ছাত্রলীগের হল দখলকারী গ্রুপের বিরুদ্ধে কখনও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করেনি। আনন্দ হত্যার পর হত্যার সাথে জড়িত বলে আদালতে অভিযুক্ত নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হলে ছাত্রলীগের অন্য গ্রুপের দখলে চলে যায় হলগুলো। এই গ্রুপের কিছুসংখ্যক নেতা-কর্মী ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। অভিযুক্তরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহিষ্কৃত হলে এবং ছাত্র বিক্ষোভের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হলে সেই সুযোগে আনন্দ হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। কিন্তু এদের দীর্ঘকালীন অবস্থানের সময়ে ছাত্রঐক্যের ব্যানারে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট এবং ছাত্র ইউনিয়ন কোন আন্দোলন বা বিক্ষোভের আয়োজন করেনি। ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্পর্শকাতরতা ও ঘৃণাবোধ সক্রিয় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু গণতন্ত্রকামী প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে দুই ধারার অভিযুক্ত ও বহিষ্কৃত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে একইভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছিল যৌক্তিক। কিন্তু এদিক থেকে তাদের নীরবতা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। অবশ্য বর্তমান সময়ে হল দখল-পুনর্দখলের নাটকের পর সাধারণ ছাত্রঐক্যের ব্যানার থেকে 'ধর্ষক' ও 'কিলার' উভয় গ্রুপের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানের কথা বলা হচ্ছে। গত বছর ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন দানা বেঁধেছিল তাতে ছাত্রঐক্যের আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। কিন্তু এবার আন্দোলনকারীদের আচরণ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট না হওয়ায় উল্লিখিত সমর্থন আদায়ে তারা ততটা সমর্থ হচ্ছে না। তাছাড়া আন্দোলনকারীদের কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন পদক্ষেপ তাদের সন্ত্রাসবিরোধী ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। যেমন ৩১ জুলাই রাতে হলগুলোতে পুলিশী অভিযানের পর যখন দখলকারী সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তখন কার্যত ফাঁকা হলগুলোতে ছাত্রঐক্যের মিছিলের ওপর চড়াও হওয়া ও বিভিন্ন কক্ষ তছনছ করার পিছনে কোন যুক্তি ছিল না (যদিও এই ঘটনাকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের ভাষায় ছাত্রঐক্যের অভিযানে সন্ত্রাসীদের পলায়ন হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে)। বিশেষ করে এই ঘটনায় ছাত্রীদের ছাত্র হলগুলোতে চড়াও হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এ ধরনের অভিযানের যৌক্তিকতা নিয়েও নানান প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

ঘটনাপ্রবাহ আরও বিস্তারিত না করে এখন জনকণ্ঠ সম্পাদকীয়র দাবি ও প্রত্যাশা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা যাক। ছাত্র সংগঠনগুলোর একাংশ এবং দেশবাসীর অনেকেরই একইভাবে দাবি ও প্রত্যাশা থাকবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ধরনের তাবত সঙ্কট থেকে মুক্তি দিক। প্রত্যাশাটি যৌক্তিক ও স্বাভাবিক, কিন্তু সকলের হয়ত জানা নেই যে, বর্তমান রাজনৈতিক-সংস্কৃতির বাস্তবতায় এর বাস্তবায়ন কতটা অস্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এ ধরনের সঙ্কট সৃষ্টি হলে টের পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কতটা অসহায়। ঘটনা-দুর্ঘটনা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের রিমোট কন্ট্রোলটি কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে থাকে না। এটি থাকে কেন্দ্রে অবস্থানকারী রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে। যাদের অঙ্গুলী হেলন ছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের নড়া চড়া বন্ধ থাকে। তাই হল দখল হয়। ছাত্র, সন্ত্রাসী ও বহিরাগত অস্ত্রধারীরা প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে হল পাহারা দেয়, ভাংচুর করে, রক্ত ঝড়ায়, আর তার প্রতিবিধান করতে গিয়ে গলদঘর্ম হন অসহায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। অনেক ঘাট পেরিয়ে তবে তাকে পেতে হয় পুলিশী সাহায্য। স্থানীয় থানার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে হল 'অভিযান' সম্ভব নয় বলে উপাচার্যকে অপেক্ষা করতে হয় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুমোদনের। সেই অনুমোদনের পর তাতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রধানের অনুমোদন লাগে। অতঃপর ম্যাজিস্ট্রেট সংগ্রহ ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার 'ধর্ষক গ্রুপ' হল দখলের পর পরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একই ধারায় চেষ্টা করেছে। সমস্ত ঘাট পেরিয়ে আড়াই দিন পর সাড়া মিলেছে। ততক্ষণে অস্ত্রধারীদের নিরাপদে গা ঢাকা দেয়ায় তেমন সমস্যা ছিল না। শোনা যায়, সন্ত্রাসীরা ছাত্রলীগের পরিচয়ে পরিচিত বলে সরকারী সিদ্ধান্ত আসতে সময় লেগেছে। নিজ দলের অন্তর্কলহের বিষয়টি জড়িয়ে আছে বলে নেতাদের মধ্যে পক্ষ অবলম্বনের ঘৃণ্য মানসিকতাও ছিল। তাছাড়া শিক্ষক রাজনীতির ক্ষমতালিপ্সু অংশের পরোক্ষ মদদের বিষয়টিকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। বর্তমান সময়ের উপাচার্যদেরও নানান সমস্যা থাকে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হলেও তাঁরা চূড়ান্তভাবে পদ লাভ করেন (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) ক্ষমতাসীন সরকারের কৃপায়। ফলে সরকারী দলের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা থেকে যায়। তাই সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের শাসক করায় তাদেরও সমস্যা রয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতার পরও যদি কোন উপাচার্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়ার সাহস দেখান বা সিন্ডিকেট উদ্যোগী হয় তবুও তা বর্তমানের বাস্তবতায় কার্যকর করা সম্ভব হয় না। এবার জাহাঙ্গীরনগরের ঘটনাপ্রবাহ এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করেছে। সন্ত্রাসী তৎপরতার শুরুতেই সিন্ডিকেটের অনুমোদনে উপাচার্য মহোদয় আইনশৃঙ্খলা [illegible]ক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে আগাম অনুমতি দিয়ে [illegible]রেখেছেন দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের [illegible]ফতার করে ক্যাম্পাস নিরাপদ করতে। কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্তের ঢিলে-ঢালা ভাব এ দেশের কলুষ রাজনীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

উপরে উল্লিখিত বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি রেখে সকলেই উপলব্ধি করবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে হল দখল ও অন্যান্য সন্ত্রাস বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের করণীয় খুবই সামান্য। জাতীয় রাজনীতির অঙ্গসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদেরই দাপটের রাজত্ব ক্যাম্পাসে। সুতরাং এদের মধ্য দিয়ে যে সন্ত্রাস আর নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় তার ইন্ধন ও উৎস যেখানে, পরিত্রাণ পাওয়ার মহৌষধও পেতে [illegible] সেখান থেকে। এ কারণেই জাতির ভ[illegible]ষ্যত গড়ার স্বপ্নপুরী শিক্ষায়তনের সুস্থ [illegible]বিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষকে [illegible] হতে হবে। চাপ সৃষ্টি করতে হবে জাতীয় নেতৃত্বের ওপর এবং রাষ্ট্র যন্ত্রের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় রাজনৈতিক দ[illegible]গুলোর অঙ্গসংগঠনের নামাবরণে সন্ত্রাসী পোষণ এখন ওপেন সিক্রেট। এ কারণে সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের মধ্যে যে আত্মগ্লানি কাজ করে তা [illegible]ন হয় না। তাই জনমত সৃষ্টি করে এদের মধ্যে সুস্থ চিন্তার উদ্রেক ঘটাতে বাধ্য করতে হবে। এ বিষয়টি এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বর্তমান ধারায় বড় দলের লেজুড়বৃত্তি করে যে ছাত্র রাজনীতি চলছে তাকে অক্ষুণ্ন রেখে সুস্থতা অর্জন করা সম্ভব নয়। দলীয় পরিচয়ে নয় ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনগুলো যদি স্বাধীন সত্তা লাভ করে তবেই সম্ভব সন্ত্রাসবিরোধী পরিবেশ সৃষ্টি করা। কারণ সকল ছাত্র সংগঠনের পেশীতে শক্তিই আসে মূল জাতীয় নেতৃত্বের মদদে। ফলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি ক্ষমতা উপাচার্য বা সিন্ডিকেটের হাতে থাকে না। যদিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারী দলের [illegible]নেক কর্তাব্যক্তিই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন। কিন্তু তার পরও দলীয় সন্ত্রাসীদের অস্ত্র প্রদর্শন, হল দখল ও নিরাপদে প্রস্থান দে[illegible] তাঁদের বক্তব্যের [illegible]ন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন [illegible] দিয়েছে।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রধান দায়িত্বই সরকারকে নিতে হবে, একই সাথে তাদের জবাবদিহি করতে হবে জনগণের কাছে। জবাবদিহিতার ব্যাপারে বি[illegible]বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও রেহাই দেয়া যাবে না। সন্ত্রাস প্রতিরোধে তাদের আন্তরিকতার ব্যাপারে সকলকে স্বচ্ছতা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে তাদেরও বাস্তবতার নিরিখে কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। না হলে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীরা সুযোগ নিতে পারে। আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে পারে। ক্যাম্পাসের সর্বস্তরের অধিবাসীদের আস্থা ও সহমর্মিতা অর্জন ছাড়া কোন যৌক্তিক আন্দোলনও দুর্বল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্চপর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকেই রাজনৈ[illegible] ও গোষ্ঠীস্বার্থ চিন্তার উর্ধে উঠে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। [illegible] রিমোট কন্ট্রোল' ক্যাম্পাসের বাইরে রেখে সম্ভব নয় [illegible] শান্তি বজায় রাখা।